ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

ওঙ্কার: বাঙালির আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রকাশের শিল্পভাষ্য

*পুরনজিত মহালদার

সারসংক্ষেপ: বঞ্চনা ও নিপীড়নের ভেতর ক্রমাগত ধারাবাহিক কূটকৌশলের প্রয়োগ, সত্তাগত ভাষা সংস্কৃতির ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ, দাসত্ব আরোপের তাগিদে একের পর এক প্রচণ্ড আঘাত, বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে রক্তাক্ত রাজপথ এবং এই সব আত্মক্ষত, লাঞ্ছনা, অপরিমেয় বেদনা, যন্ত্রণা, হতাশার অন্ধকূপ থেকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল বাংলাদেশের নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী। জাতিসত্তার অন্তর্গত ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সর্বক্ষেত্রে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই স্বাধিকার ছিনিয়ে আনা সম্ভব এবং সেই মানসেই উপনিবেশিত বাঙালি বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর সম্মুখে । ফলে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ব্যক্তি বা সমগ্র জাতির অস্তিত্বসংকট ও অন্তর্চেতনার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার উর্দ্ধমুখী প্রতিবাদ ও সংগ্রাম থেকে সংঘটিত হয় গণঅভ্যুত্থান। ঊনসত্তরের এই উত্তাল গণঅভ্যুত্থানের সময়পটে উন্মোচিত হয়েছে আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) *ওঙ্কার* (১৯৭৫) উপন্যাসে।

উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনা ও সামূহিক ক্রিয়াকলাপ যুগের অগ্নিতাপে স্নাত হয়ে উঠেছে। গণজাগরণের সেই চেতনাবোধের আলোকেই 'বোবা বউয়ের' রুদ্ধকণ্ঠের রক্তাক্ত প্রকাশ আর সকল প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে বাঙালির আত্মউন্মীলন হয়ে উঠেছে সমার্থক শিল্প আখ্যান। ঘরের বাইরের উত্তাল মিছিল আর ঘরের মধ্যে আবদ্ধ বোবা বউকে উপলক্ষ করে কী ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক? বোবা স্ত্রীর বাকহীনতার গভীরে নিহিত যে তরঙ্গায়িত হৃদয়ভাবনা তাকে কোন দৃষ্টিকোণে শিল্পরূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি? এ উপন্যাস পাঠের শুরুতে এরকম নানামাত্রিক প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমরা। বায়ান্নর পরবর্তী সময়প্রবাহ এবং ঊনসত্তরের সেই গণজোয়ারের পটভূমিই উপন্যাসের বিষয়-আশয়কে ওই তরঙ্গায়িত বৃত্তে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

আহমদ ছফার রাজনীতি সচেতনতামূলক প্রথম এই উপন্যাসটির নাম *ওঙ্কার*। *ওঙ্কার* প্রতীকধর্মী উপন্যাস। বাঙালির জাতীয় জীবনের বিবর্তনশীলতার সঙ্গে কথকের বোবা স্ত্রীর আত্মপ্রকাশকে প্রতীক অর্থে ব্যবহার করেছেন লেখক। 'ওঙ্কার' শব্দ 'ওঁ' থেকে এসেছে। ওঁ = ওম্-এটি 'অ' (= বিষ্ণু) + 'উ' (= শিব) + 'ম' (= ব্রহ্মা) এই তিন সাংকেতিক অক্ষরের সমাহার। এটি সকল মন্ত্রের আদি বীজ বা 'প্রণব'। সব ধ্বনির আদি, সব অক্ষরের আদি ওঙ্কারকে লেখক বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। 'সংহত, সুগঠিত ঘটনা একটি কেন্দ্রাভিমুখী লক্ষ্যে বিন্যস্ত হয়েছে এ-উপন্যাসে। সামরিক শাসনপীড়িত, অবরুদ্ধ জাতীয় অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে সুবিধাবাদী, প্রতারক ষড়যন্ত্রপরায়ণ এবং পাকিস্তানি আদর্শের ধ্বজাবাহী আবু নসর মোক্তারের বোবা মেয়ে। প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ (Peripheral Character's Point of View) থেকে রচিত এই উপন্যাসের কথক কেন্দ্রীয় চরিত্র বোবা মেয়ের স্বামী।'[১] লেখক ছোট পরিসরের এই

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উপন্যাসের ভেতর বাংলা নামের অস্তিত্বের জন্মকথা বিবৃত করতে গিয়ে আসলে বাঙালি জাতির প্রকাশবেদনা কিংবা জাতীয় জাগরণকেই চিত্রিত করেছেন।

একটি পারিবারিক কাহিনির মধ্য দিয়ে বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বিবৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণে-উৎপীড়নে পর্যুদস্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তার বিবরণ আছে এখানে। স্বল্প পরিসরের এ উপন্যাসে আহমদ ছফা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় দু'দশকের রাজনীতিকে ধারণ করেছেন। উত্তম পুরুষের জবানিতে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তানের মুখে তাঁর পিতা ও পূর্বপুরুষদের জীবন-যাপনের সম্যক ধারণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনীতে প্রবেশ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের কথক বা নায়ককে স্থাপন করে সময় ও সময়ের মানুষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের পটভূমি। প্রথম অধ্যায়ে অতীতের সাথে বর্তমানের অর্থাৎ বিভাগোত্তর সময়ের পূর্বপাকিস্তানের তুলনীয় ভাব বা আবহ সৃষ্টি করেছেন। কাহিনি এখানে Flat. তবে ঔপন্যাসিকের পরিকল্পিত শব্দগ্রন্থনে ধীরে ধীরে দৃশ্যায়িত হয়ে উঠেছে উনসত্তরের বাংলাদেশ। প্রতিটি বাক্যবন্ধে উচ্চকিত হয়েছে উনসত্তরের ধোঁয়াটে পরিমণ্ডল, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে আত্মাধিকার অর্জনের দুর্মর জয়ধ্বনি। মিছিলে-শ্লোগানে, বিক্ষোভে-বিপ্লবে,আত্মজাগরণের চূড়ান্ত স্পন্দনে একটি জাতি কীভাবে সমুদ্রের জোয়ারের মতো সবকিছু ভেঙেচুরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছে তার শিল্পিত সংবেদ *ওঙ্কার*।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করায় কথকের পিতার আভিজাত্যের উৎস তালুকদারি প্রথাও উঠে যায়। কথকের পিতার এককালের মামলা-মোকদ্দমার ডান-বাম হাত এবং শলা-পরামর্শের 'নির্ভরযোগ্য আড়ত' আবু নসর মোক্তার হাইকোর্টের মামলায় জয়ী হয়ে তাদের ভিটে-মাটি সব নিলাম করে নেয়। 'এরই মধ্যে অর্থ স্বার্থ বুদ্ধি পরামর্শের জোরে মোক্তার সাহেব একজন দেশের কেউকাটা হয়ে উঠেছিলেন।'[২] বিভাগোত্তর সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণির মানুষ পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হন। এই উপন্যাসে আবু নসর মোক্তার তাদের প্রতিনিধি। আবু নসর মোক্তার কথক পরিবারের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে নিজের 'বোবা' মেয়েকে নায়কের জীবনে জুড়ে দেয়।

দেশভাগের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের ধ্বংসস্তূপের ওপর আসন গেড়ে বসে নয়া ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তার, সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও শাসনব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের চিরাচরিত জীবনধারার ওপর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন আসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় এমনকি সামাজিক বিন্যাসে। '১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান তাঁর স্বৈরাচারী শাসন সারা পাকিস্তানের বুকে কায়েম করে পূর্ব বাংলাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের কণ্ঠকে রোধ করে, নতুন উদ্যমে ও নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে শাসকশ্রেণি পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর জাতিগত নিপীড়ন, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ হয়ে

দাঁড়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।'[৩] সামরিক শাসক আইয়ুব খানের দমন নিপীড়নে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। উপন্যাসে কথকের বর্ণনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'দেশে ত্বরিত গতিতে সময় পাল্টাচ্ছিল। পৃথিবীর গভীর গভীরতরো অসুখের খবর সংবাদপত্রের পাতায় কালো ফুলের মতো ফুটে থাকে। দেশে আইয়ুব খান সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গেড়ে বসেছেন। সংবাদপত্রের ব্যানারে খান সাহেবের এক জোড়া গোঁফ হুংকার দিয়ে জেগে থাকে। দেখতে না দেখতেই দেশের জীবনপ্রবাহের মধ্যে খান সাহেবের অপ্রতিহত প্রভাব প্রবল সামুদ্রিক তিমির মতো ছুটাছুটি করছিল।'[৪]

আইয়ুব খান ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষকে সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা প্রদান করে তাঁর অনুগত করে রাখেন। ক্ষমতার আসন পাকাপোক্ত করতে তিনি প্রবর্তন করেন নতুন শাসনব্যবস্থা। নতুন শাসনতন্ত্রের 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামক বিচিত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' সৃষ্টি করেন। আইয়ুব খানের শাসনামলে এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানে অসহনীয় নির্যাতন, নিপীড়নের পাশাপাশি অর্থনীতিতেও গড়ে তোলে বঞ্চনার পাহাড়। উপন্যাসে কথকের শ্বশুর আবু নসর মোক্তার পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে অর্জন করেন বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি। ক্ষমতার দাপটে তিনি সংখ্যালঘু নিরীহ ব্রাহ্মণ পরিবারকে 'সীমান্তের ওপারে ছুড়ে' দেন। পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি এই আবু নসর মোক্তারের আনুকূল্যে তাঁর শালা-সম্বন্ধীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে 'রীতিমতো লাল' হয়ে যায়। আবু নসর মোক্তারের উপরে ওঠার কাহিনি পাওয়া যায় কথকের বর্ণনায় : 'আমার শ্বশুরের মতো মানুষেরা অন্ধকার থেকে সূর্যালোক ফাঁকি দিয়ে শহরের ফ্লাশ ক্যামেরার সামনে উঠে আসতে লেগেছেন। আগেই তিনি মোক্তারি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মরা গরুর খালের নাহান আদালতের ময়লা বেঢপ শামলা গা থেকে গাছের পুরনো বাকলের মতো ঝরে পড়েছে সে কবে। এখন তিনি আদ্দির গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরেন। সোনার বোতাম ঝিলিক দেয়। হাতে হীরার আংটি ঝকমক করে। তিনি আইয়ুব রাজত্বের শক্ত একটা খুঁটি না হলেও ঠেকনা জাতীয় কিছু একটা তো বটেই।'[৫]

প্রতীকধর্মী এই উপন্যাসে লেখক কথকের বোবা বউ চরিত্রের মাধ্যমে ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের টানাপোড়েন, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাঙালির রাজনৈতিক জাগরণের ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিত্রিত করেছেন। 'পারিবারিক কাহিনী হলেও, এই রচনায় নিছক পারিবারিক জীবনের ছবি এবং ভাঙা-গড়ার রূপ, দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলাই মূল লক্ষ্য নয়। প্রতীকের আশ্রয়ে বৃহত্তর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছেন বলেই লেখক সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি বিধৃত করেছেন অনেকটা পরোক্ষ রীতিতে।'[৬] পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তান সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে অর্থনীতিতে গড়ে ওঠে ব্যাপক বৈষম্য। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন করে, জনগণকে বঞ্চিত করে সম্পদশালী হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণেই পূর্বপাকিস্তানের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী আন্দোলন সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। এর কারণ হিসেবে আহমদ ছফার অভিমত: 'প্রতিটি সফল রাজনৈতিক পালাবদলের বেলায় একটি

অর্থনৈতিক যুক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে যে সকল বড় ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল, রূপান্তর এবং ব্যয় পরিবর্তন ঘটে গেছে তার সবগুলোর মধ্যে অর্থনীতি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।'[৭] ষাটের দশকের শুরু থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে আন্দোলন-সংগ্রামের সূত্রপাত। বাঙালি ইতোমধ্যে বুঝতে পারে যে আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া নির্যাতন, নিপীড়নের অবসান সম্ভব নয়। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আইয়ুব খান প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ গঠন করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল মোনেম খানকে নিযুক্ত করেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর পদে। গভর্নর মোনেম খান ছাত্র আন্দোলন প্রতিহত করতে ছাত্র রাজনীতিতে এন.এস.এফ বা 'ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন' নামক গুণ্ডা বাহিনী সৃষ্টি করেন। কিন্তু ছাত্রসমাজ এন.এস.এফের ভয়ে পিছপা হয়নি। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচারপত্রে বলা হয়:

> ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার বুকের রক্তে যে আইয়ুবশাহীর হাত এখনো রহিয়াছে সিক্ত-কলঙ্কিত, সেই জুলুমশাহীকে সমূলে নিপাত করিবার দিন আসিয়াছে আজ। দিন আসিয়াছে বিগত ছয় বছরের অত্যাচার নির্যাতন আর নির্মম শোষণের জবাব দান করিবার, ছয় বছর পূর্বে যে ডিক্টেটর আইয়ুব দেশবাসীকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজের একনায়কত্বকে চিরস্থায়ী করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, যে আইয়ুব দেশবাসীকে 'গরু-ছাগল' আখ্যা দিয়া নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ' রাষ্ট্র পরিচালক ও 'মহাশক্তিশালী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, সেই মহাশক্তিধর আইয়ুবের পদতলে আজ ভূমি কাঁপিতেছে থরথর। শোষিত নির্যাতিত পাকিস্তানের দশ কোটি নর-নারী আজ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে বিসুভিয়াসের মতো। জনতার রুদ্র রোষের লেলিহান বহ্নিশিখায় পতঙ্গের মত পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে দুশমন এবং পাপী-তাপী, অত্যাচারী, শোষক-শাসকের দল। আজ আসিয়াছে সেই দিন। ঘোষিত হইবেই স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় আর গণতন্ত্রের মহান বিজয়।[৮]

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর একের পর এক আঘাত হানেন। পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংস করে সবকিছুতে পাকিস্তানিকরণ করা হয়। ১৯৫৯ সালে বাংলা বর্ণমালায় রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ চলাকালে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার না করা এবং ১৯৬৭ সালের জুন মাসে রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রতিটি অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। উপন্যাসে ষাটের দশকের উত্তাল সময়ে কথকের বোনের গান শেখা, তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর কণ্ঠে গান শুনে 'বোবা' স্ত্রীকে গান শেখানোর ইচ্ছা পোষণ করা মূলত বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত হতে হতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। উপন্যাসে এর বিবরণ পাওয়া যায় কথকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কথকের বর্ণনায় : 'দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। যেখানে দেশের গভীর ব্যথা, মার্শাল সাহেবের গোমড়ামুখো সৈন্যেরা সেখানেই কাঁটা বসানো বুট জুতোর লাথি মারে। প্রথম প্রথম গোটা দেশ আঘাতের বেদনায় গুঙিয়ে উঠত। ক্ষত থেকে রক্ত বের হতো। আওয়াজে যন্ত্রণা ফুটে থাকত। প্রায়

এক যুগ ধরে লাথি খেয়ে ব্যথা জর্জর অংশ ডাঁটো হয়ে উঠেছে। এখন প্রতিবাদ করার জন্য মুখিয়ে উঠছে। যন্ত্রণা, বেদনা এবং দুঃখের কারখানা থেকেই প্রতিরোধের শাসানো আওয়াজ ফেটে ফেটে পড়ছে। তার ধার যেমন তীক্ষ্ণ, ভারও তেমনি প্রচণ্ড।'[৯]

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবি উত্থাপন করেন। ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের ৮মে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। 'জেল জুলুমের প্রতিবাদে এবং ৬ দফার সমর্থনে আওয়ামী লীগ ৭ জুন হরতাল আহ্বান করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল হতে থাকলে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে এবং এতে মনু মিয়া, মুজিবুল হকসহ ১১ জন শহিদ হন।'[১০] এর প্রতিবাদে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে বাঙালিরা। গণজাগরণের জোয়ারে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান। অধিকার আদায়ের দৃপ্ত প্রতিরোধ প্রতিবাদে বাঙালির কণ্ঠে নেমে আসে গণসংগীত আর আগুনঝরা শ্লোগান। মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে যায় শহর বন্দর গ্রামগঞ্জ। উপন্যাসে তার বর্ণনা: 'সারাদেশে শ্লোগানের ঢল নেমেছে। পথে-ঘাটে মানুষ কেবল মানুষ। চন্দ্রকোটালের জোয়ারের জলের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে শ্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলের কোটি কোটি বর্শাফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে।'[১১]

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ১১ দফার ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলনের বেগ ত্বরান্বিত হয়। 'রাতের অন্ধকারে বেবাক রাস্তায় কারা সব ভয়ংকর পোস্টার সেঁটে রাখে। পোস্টারের বুকে সর্বনাশের নীল সঙ্কেত জ্বলজ্বল করে।'[১২] সর্বস্তরের জনগণের উত্তাল সংগ্রামে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আন্দোলন ঠেকাতে লেলিয়ে দেন পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালি। সাংবাদিকরা খবরের কাগজে প্রতিদিনের নির্যাতন, নিপীড়ন আর প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরেন। সেই অস্থির সময়ের চিত্রণে ঔপন্যাসিক :'শেখ মুজিব জেলে। আগরতলা মামলার বিচার চলছে। এখানে ওখানে বোমা ফুটছে, মিটিং চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মিছিল বেরিয়ে আসে। গুলি চলে। লাল তাজা খুনে শহরের রাজপথ রঞ্জিত হয়। সরকারি পত্রিকার অফিসগুলোতে হুতাশনের মতো প্রলয়ংকরী অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। প্রতিটি সকালেই খবরের পাতা উল্টোলেই টের পাওয়া যায় ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। গতিকটি সুবিধের নয় বলে মনে হয়। আইয়ুব খানের সিংহাসন ঝড়ে পাওয়া নায়ের মতো টলছে।'[১৩]

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসে বাঙালির আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বোবা নারীর চেতনার আশ্রয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অবর্ণনীয় শাসন-শোষণে পিষ্ট হয়ে বোবা নায়িকার মতোই নির্বাক হয়ে যায়। 'নায়কের 'বোবা' স্ত্রীর কথা বলার অর্থাৎ তার আত্মপ্রকাশের আকুতি এ রচনায় শুধু একজন ব্যক্তিমানুষের

বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার আকুতিই নয়, বলতে গেলে সমগ্র দেশের আত্মপ্রকাশ ও বাকশক্তি অর্জনেরই আকুতি এবং রক্তাক্ত সংগ্রামেরই আলেখ্য।'[১৪] আইয়ুব খানের দমননীতির বিপরীতে বাঙালির প্রতিক্রিয়া ছিল সংগ্রামী। দেশবাসী ষাটের দশকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে নীরব নিশ্চুপ ছিল না। সচেতন প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মাধ্যমে আইয়ুব খানের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তারা। সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতায় মাতাল হয়ে উঠেছিল বাঙালি। বাঙালির এই আত্মপ্রকাশের স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে কথকের 'বোবা' স্ত্রীর মধ্য দিয়ে। কথকের ভাষায় :

> আমার স্ত্রী বাকশক্তিহীন দশাটিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়নি। তার শরীরের প্রতিটি কণা, প্রতিটি অণু-পরমাণু এই বোবাত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। আমি নিজের চোখে তো দেখলাম। তারও মনের গভীরে ফুলের স্তবকের মতো কথা স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। তার মনের ভেতর সুখ-দুঃখের আকারে যা ঘটছে এবং বাইরের পৃথিবীতে সুন্দর কুৎসিত যা বিরাজমান রয়েছে, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে - সব কিছুরই একটি নাম আছে। এই নামটিকেই সে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু পারে না। বাগযন্ত্রটি খারাপ এবং অকেজো বলে।[১৫]

আইয়ুব খানের সমর্থক আবু নসর মোক্তারের চাকরিজীবী, সুবিধাবাদী, দুর্বল, মিছিলভীরু জামাই এই উপন্যাসের কথক রাজপথে মিছিল দেখলেই দরজা জানালা বন্ধ করে কানে হাত চাপা দেয়। 'কালের ঝড়' থেকে দূরে থাকতে আইয়ুব খানের মতোই তাঁর এ প্রয়াস। কিন্তু আইয়ুব খানের পুরো শাসনকালটাই যখন 'পাগল রেসের ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলছে' তখন অনিবার্যের সঙ্গে বিবাদ করা হয়ে ওঠে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাহিনী একেবারেই ঘরে আবদ্ধ। কাহিনী কিছুটা শ্লথ। তবে 'বোবা' নায়িকার রূপান্তর এই অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বোবা স্ত্রীর গান গাওয়ার প্রচেষ্টার কথা প্রচারিত হওয়ায় নায়ক চরিত্রের অস্থিরতা বা টেনশন বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের কাহিনী ঘরের বাইরে বেরিয়েছে। দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ার সাথে বোবা নায়িকার রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাযুজ্য লক্ষণীয়। কথকের বাক প্রতিবন্ধী স্ত্রী মিছিলের শব্দ শুনে স্থির হয়ে থাকতে পারে না :

> মিছিলের ঘ্রাণ পেলেই সে দরজা জানালা হাট করে খোলা রাখে। কি করে খবর পেয়ে যায় জানিনে। শুনেছি বোবারা কানে খাটো। কিন্তু কি করে এমন ব্যাপার ঘটে আমি বলতে পারব না। মিছিল আসতে দেখলেই উন্মুখ হয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে, ওরা কি বলছে। সূর্যমুখী যেমন সূর্যের সামনে প্রতিটি পাপড়ি মেলে ধরে আলো হতে তাপ হতে প্রাণকণা শুষে নিয়ে ফুটে ওঠে; সেও তেমনি আবেগে মিছিলের সামনে এক জোড়া উৎকীর্ণ শ্রবণ বিছিয়ে রাখে। দ্রুত পায়ে মিছিল আসে, দ্রুত পায়ে চলে যায়। কিন্তু তার পরেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। মিছিলের ধ্বনি তার অন্তর্লোকে চুম্বকের মতো ক্রিয়া করে। আপনা থেকেই চোখজোড়া ঝিকিয়ে উঠে দুহাতে শক্ত করে জানালার শিকগুলো আঁকড়ে ধরে সমস্ত চেতনা জনারণ্যে আর শব্দারণ্যে কামানের গোলার মতো ছুড়ে মারে।[১৬]

'পাগলা যুগের' দুর্মর গতি আইয়ুব খানের শাসনের বাঁধ ভেঙে অবিরাম এগিয়ে যায়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে ওঠে। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর,' 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব' প্রভৃতি শ্লোগানে

প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাজধানী ঢাকাসহ সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পল্টনে মওলানা ভাসানীর জনসভা, লাটভবন ঘেরাও এবং ৭ ডিসেম্বরের অভাবনীয় হরতালের মধ্য দিয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সর্বগ্রাসী আগুনের মতো। ঊনিশশো ঊনসত্তরের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের করে। '২০ জানুয়ারি। বীর ছাত্র-যুবক সেদিন পুলিশ, ই.পি.আর -এর সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলো এবং এদেরকে পেছনে হটিয়ে দিয়েছিলো। এই আন্দোলনেই ব্যান্ডেজবাঁধা ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে গুলী করে হত্যা করা হয়।'[১৭] পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ নিহত হওয়ার পর বাঙালি জাতীয়তাদবাদী আন্দোলনের গতি আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালের ২১ জানুয়ারি 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের নিহত হওয়ার ঘটনা প্রকাশিত হয়। 'ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী আসাদুজ্জামানের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য ছাত্ররা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁকে দ্রুত মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।'[১৮]

উপন্যাসে কথকের বর্ণনায় আসাদ হত্যার ঘটনা এবং তৎপরবর্তীতে ঢাকা শহরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি, আন্দোলনের সহিংসতা, সেনাবাহিনীর নৃশংসতা এসেছে এভাবে :

> হঠাৎ করে শহরে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। কোথায় পুলিশ নাকি আসাদ নামে কোনো একজন ছাত্রকে গুলি করে মেরেছে। তার পরদিন থেকে গোটা শহরে অলক্ষুণে ব্যাপার একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। যে দিকেই যাই, যেদিকেই তাকাই, দেখি মানুষের মিছিল। পুলিশ আসে, ক্ষিপ্ত মানুষের ওপর লাঠি চার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে মারে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফিরে যায় না। শেষ পর্যন্ত ঘরের মানুষদের জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য রাস্তায় গোমড়ামুখো বাঘমার্কা মিলিটারি নামে।[১৯]

কিন্তু বাঙালি কোনো কিছুকে পরোয়া না করে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। আইয়ুব খান আন্দোলন ঠেকাতে বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা করে। নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেনাবাহিনী। কথকের ভাষায়:'মিলিটারিরা রাস্তা-ঘাটে টহল দেয়। বুট জুতোর একটানা আওয়াজ পীচের রাস্তার বুকে গেঁথে থাকে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফিরে না। তারা সেনাবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে রাজপথ দখল করে। সৈন্যরা রাইফেলের বেল্টে টান দেয়, ঝাঁকেঝাঁকে গুলি বেরিয়ে আসে। মানুষের বুকে গুলি লাগে। রাজপথে লাল টাটকা খুনের প্লাবন ছোটে। রাজপথে আবার মেঘনা পদ্মার স্রোতের মতো মিছিল নামে। গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপে। মিলিটারি উঠে যেতে বাধ্য হয়। এই ছিল সত্যিকারের অবস্থা।'[২০]

প্রতিবাদী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর জনতার স্রোত সমুদ্রের জোয়ারের মতো ফুলে ওঠে। গণতন্ত্রের মুখোশধারী আইয়ুব খানের সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তখন বাঙালির 'লক্ষ প্রাণ ঐক্যের মন্ত্রে একসঙ্গে বাঁধা পড়েছে। এমনি লক্ষ লক্ষ ঝরনা প্রবল প্রাণ তরঙ্গে নেচে নেচে একসঙ্গে উঠছে।'[২১] 'বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো' মিছিলের গর্জন সবকিছুতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্বাধিকার ও মুক্তির

লক্ষ্যে এগিয়ে যায় বাঙালির অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। আত্মজাগরণ আর আত্মপ্রকাশের তাগিদে সমস্ত জড়তা আর বাধা-নিষেধের শেকল ছিন্ন করে তারা। আলোর পানে ছুটে চলে বাঙালির বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। আহমদ ছফা বাঙালি জাতিসত্তার এই স্ফুরণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাকশক্তিহীন নায়িকার কণ্ঠে 'বাঙলা' শব্দের উচ্চারণ হয়েছে এভাবে :

> প্রকাশ। হায়রে প্রকাশের ব্যথা। গোটা বাংলাদেশের শিরা-উপশিরায় এক প্রসব বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুকফাটা চিৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে নবজন্মের আকুতি। আমার বুকেও তরঙ্গ ভাঙছে। কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি। চারপাশের সবকিছু প্রবল প্রাণাবেগে থরথর কাঁপছে। বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী, সমুদ্র, পর্বত কাঁপছে। নরনারীর হৃদয় কাঁপছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আচানক বোবা বৌ জানলা-সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে। ভেতরে কি একটা বোধহয় ছিঁড়ে গেছে। আমি মেঝের ছোপ-ছোপ টাটকা লালরক্তের দিকে তাকাই, অচেতন বৌটির দিকে তাকাই। মন ফুঁড়েই একটা প্রশ্ন জাগে– কোন রক্ত বেশি লাল। শহিদ আসাদের - না আমার বোবা বৌয়ের?[২২]

প্রতীকধর্মী এই উপন্যাসের এক দিকে কথক বা নায়কের পারিবারিক জীবনের কাহিনি-অন্যদিকে পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সেই সাথে বিশাল জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের, আত্মমুক্তির উন্মুখতার চিত্র পাওয়া যায়। কথকের বাক প্রতিবন্ধী 'স্ত্রীর কথা বলায় অর্থাৎ তার আত্মপ্রকাশের আকুতি এ-রচনায় শুধু একজন ব্যক্তিমানুষের বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার আকুতিই নয়। বলতে গেলে সমগ্র দেশের আত্মপ্রকাশ ও বাকশক্তি অর্জনেরই আকুতি এবং রক্তাক্ত সংগ্রামেরই আলেখ্য।'[২৩] এই উপন্যাসে লেখকের প্রতীকী উপস্থাপনার কৌশল সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। বাকশক্তিহীন সন্তানসম্ভবা নারীর কণ্ঠে রক্তাক্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে 'বাংলা' উচ্চারণের মাধ্যমে লেখক রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাঙালির অগ্রযাত্রাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। তখন বাঙালি জাতিকে এক ঐক্যে, এক বিন্দুতে মিলিত করার ক্ষেত্রে 'জয়বাংলা' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বাঙালি জাতিসত্তার পূর্ণবিকাশে 'জয়বাংলা' শব্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। *ওঙ্কার* উপন্যাসে আহমদ ছফা বাঙালির আত্মপরিচয় ও আত্মোন্মোচনের প্রকাশ দেখাতে বাকশক্তিহীন নায়িকার কণ্ঠে 'জয়বাংলা' শব্দের খণ্ডিত রূপ 'বাংলা' শব্দের উচ্চারণ দেখিয়েছেন।

তথ্যসূচি:

---

১ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (১৯৪৭-১৯৮৭), (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৩৭

২ *তদেব*, পৃ. ২২

৩ বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ*, ১ম সং. (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ৩১৮

৪ আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, 'আহমদ ছফা রচনাবলী -৪',১ম সং,(ঢাকা:সন্দেশ,২০০৩), পৃ. ২৪
৫ *তদেব*, পৃ. ২৪
৬ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, "আহমদ ছফার উপন্যাস ওঙ্কার: ব্যঞ্জনাময় প্রতীকে সেদিনের বাংলাদেশ", মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান (সম্পা.), *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, ১ম সং. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৩৪০
৭ আহমদ ছফা, "বিকল্প উন্নয়ন কৌশল", *উপলক্ষের লেখা*, (ঢাকা: শ্রী প্রকাশ,২০০১), পৃ. ১৪৪
৮ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ড*, ১ম সং. (ঢাকা: তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২৩৭
৯ আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
১০ আসাদ চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ১ম সং. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৭
১১ আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
১২ *তদেব*, পৃ. ৩৬
১৩ *তদেব*, পৃ. ৩৫
১৪ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২
১৫ আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
১৬ *তদেব*, পৃ. ৩৭
১৭ আসাদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
১৮ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫
১৯ আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
২০ *তদেব*, পৃ. ৩৯
২১ *তদেব*, পৃ. ৩৯
২২ *তদেব*, পৃ. ৪১
২৩ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, "আহমদ ছফার ওঙ্কার: ব্যঞ্জনাময় প্রতীকে সেদিনের বাংলাদেশ," মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পা.), *আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ*, ১ম সং (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৩৪২